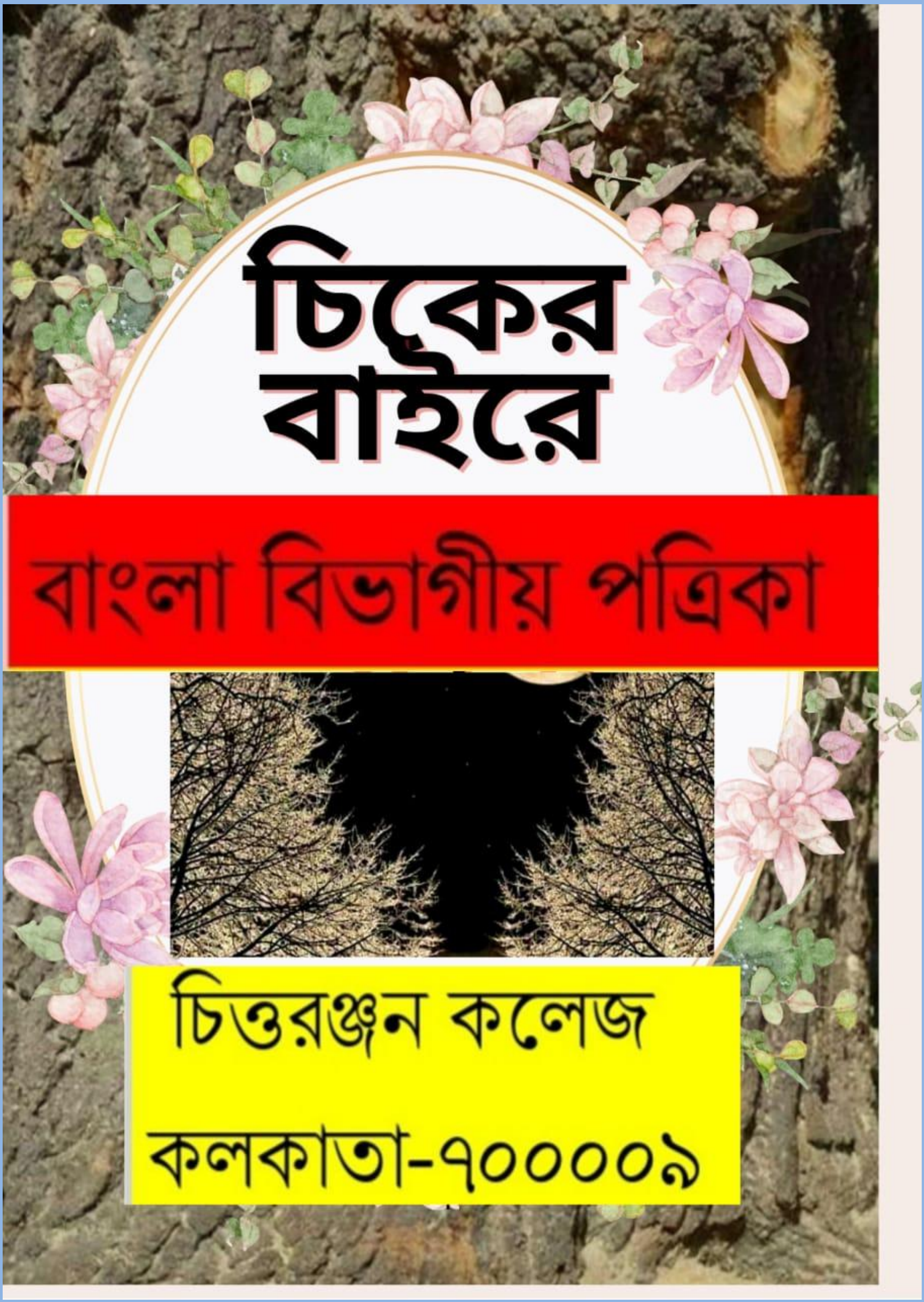
চিকের বাইরে
বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
চিত্তরঞ্জন কলেজ
কলকাতা-৭০০০০৯

সম্পাদনা

ড.নবনীতা বসু হক

সহায়তা

ড.সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,

অধ্যাপিকা ঋতমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

জ্যোতি বাগ

অলংকরণ

আশিস বসু

পরিবেশনা

পদ্মা গঙ্গা সাহিত্য ধারা, কোলকাতা

উৎসর্গ

প্রয়াত কলেজ সভাপতি

ড: প্রণবকুমার ভৌমিক

বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান

ড. নন্দিতা ব্যানার্জি

ও

কোষাগারিক

রজত চক্রবর্তী

সূচীপত্র

অধ্যক্ষের কলমে

ড. শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায় ।। ৬

বিভাগীয় প্রধানের ডেস্ক থেকে

অধ্যাপিকা ড. নবনীতা বসু হক ।। ৭

কবিতা

নমিতা মজুমদার ।। ৮

রিয়া দাস ।। ১০

সীমান্ত দে ।। ১২

অর্কদীপ দে ।।১৩

ওয়াজিদ মিদ্দে ।।১৪

প্রবন্ধ

অধ্যাপিকা ঋতমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ১৫

ভ্রমণ

চন্দ্রানী পাল ।। ১৯

গল্প

অর্ণব নায়েক ।। ২০

আঁকিবুকি

জ্যোতি বাগ ।। ২৪

স্নেহাশিষ দাস ।। ২৬

স্মৃতিকথার ডায়রি

ফারিনা খাতুন ।। ২৭

রূপম চক্রবর্তী ।।২৯

সৌমেন রায় ।। ৩১

অধ্যক্ষের কলমে

২০২০র শুরু থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া করোনা মহামারী- মানব সভ্যতাকে গিলে ফেলতে চাইছে। মৃত্যু আতঙ্কে মানুষ আজ অসহায়। কিন্তু মহামারীর এই আতঙ্ককে অবহেলায় উড়িয়ে দিয়ে, আমার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কলম ধরেছে- সৃষ্টিসুখের উল্লাসে । চিকের আড়ালে আগামী দিনের এক-ঝাঁক সম্ভাবনাময় কবি, শিল্পী, লেখক – নবনীতা নিজ প্রচেষ্টায় আড়াল থেকে তাঁদের টেনে এনে, পাঠকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

পাঠকের কাছে শুধু অনুরোধ- তারা লেখাগুলি পড়বেন – 'অসীম ক্ষমায়, ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি'।

আমি বিশ্বাস করি, এই পত্রিকা আমার ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন করে পরিচিতি দেবে, স্ব-পরিচয়ে তারা সমাজকে পথ দেখাবে। আমি শুধু তাদের একটি কথাই বলবো – আপন (চিকের আড়াল) হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া – বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া ।

ড.শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায়
চিত্তরঞ্জন কলেজ

বিভাগীয় প্রধানের ডেস্ক থেকে

চিকের বাইরে----২০২০ – ২১

আমরা সবাই একটু দক্ষিণ খোলা হাওয়া চাই, মুক্ত শ্বাস চাই আর চিকের বাইরে বেরোতে চাই। কিন্তু হয় না। ভাবলাম আর না।

এক বুক আলো পেতে তাই একটু অনলাইনে বিভাগের পত্রিকায় হাত ছোঁয়াছুঁয়ি মনের কথাসারি পথ ধরে।

মনে বাসনা ছিল সবার। অধ্যক্ষ ড.শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে ও ছাত্র ছাত্রীদের অপার উৎসাহে বাংলা বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তনী সাহচর্যে অশেষে প্রকাশিত হল চিত্তরঞ্জন কলেজের একেবারে নিজের পত্রিকা চিকের বাইরে। যারা পড়লেন তাঁরা একটা মন্তব্য পাঠান।

ধন্যবাদান্তে

নবনীতা বসু হক
বাংলা বিভাগ

করোনা যুদ্ধ

নমিতা মজুমদার
বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা

কেমন আছো তিলোত্তমা কলকাতা ?
কেমন আছো আমার ভারতবর্ষ ??
কেমন আছে সমগ্র পৃথিবী ???
ঘরবন্দি বিশ্ববাসী।
স্কুল কলেজ অফিস আদালত -
কাজকর্মের পাট চুকিয়েছে শহর।
পার্কে খেলেনা উদ্দাম শিশুদের দল।
থেমে গেছে চলমান জীবন যাপন।
পথঘাট শুনশান নিঃশব্দ
জনহীন - যানহীন।
স্তব্ধ কল্লোলিনী কলকাতা।

মনে পড়ে, একবার জঙ্গল সাফারির কথা-
খাঁচাগাড়ি বন্দি হয়ে দেখেছিলাম ---
জঙ্গল জীব নরখাদকের আনাগোনা।
আজ আমরা ঘরবন্দি ---
নরখাদক জীবাণু কোভিদ করোনার ভয়ে,

দাপটে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে মানবদেহ ---
একমাত্র খাদ্য তার ।
দেহ থেকে দেহান্তরে ---
অতিদ্রুত বিদ্যুতের বেগে ।

মানব ফুসফুসে তার বংশবিস্তার ।
কত গালভরা নাম ---
কোভিদ নাইন্টিন,
নোবেল করোনা ভাইরাস ।
শহরের রাজপথে আজ
হরিণ, ময়ূর, হায়না, হাঁস
হাতি, চিতার বিচরণ ।
ওরা আজ স্বাধীন ---
করোনা ওদের চায়না
তাঁর শুধু চাই মানব শরীর ।

কত কত যুদ্ধকালীন শব্দগুচ্ছ
জানা হল করোনা, তোমার জন্য ---
কোয়ারান্টিন, লকডাউন, হটস্পট, রেড এ্যালার্ট ।

এ লড়াইয়ে করোনা ,
তোমরা পারবে না
অপার মানব শক্তি
হার মানবে না ---
দেখে নিও করোনা ||

দুটি গদ্য কবিতা :

রিয়া দাস
পঞ্চম সেমিস্টার

.

নিম্নচাপের দিন

সকাল থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি
তার থামার বোধ হয় ইচ্ছে নেই কেবলই আকাশ ভেঙে মনের আনন্দে যেন নাচের ভঙ্গিতে তাধিন তাধিন করতে করতে নেচে চলেছে।
হয়তো বেশ ক'দিনই সে সূর্যিমামাকে বলে রেখেছে, তুমি দু'দিন দিও না হামা- তোমার কয়দিন ছুটি।
আকাশটাও ক'দিন মুখ গোমড়া করে স্থির হয়ে বসে বসে দিন গুণছে,
কবে রোদ্দুরের পাবে দেখা ?
তাই বৃষ্টির মন রাখতে তাকে বাধ্য হয়ে বললাম,
এসো সর্বদা রোদ্দুর খেলা করে আমার বুকের মাঝে।
নাহলে তুমি ঘুরে যাও দু'দিন-
তুমি তো আর ঘুরে বেড়াবে না আমার কাছে এসে মেঘেদেরকে এক করে বেশ কিছুক্ষণ কী যে চুপিচুপি গল্প করবে।তা বোঝে কার দায়?
তারপর-

হঠাৎ করে মেঘেদের হাত ধরে ধরিত্রীতে ঝরে পড়বে-
এসে আমার সাথে গল্প কর! আসো তো স্বার্থপরের মত!
চলে যাও বিদ্যুৎকে নিয়ে-
মাঝে মাঝে বেশ মজে থাকো
মেঘেদের নিয়ে ভিড় করে। ব্যস্ত। গুড়ুম গুড়ুম করে অট্টহাসিতে মেতে থাক।
আমার রোদ্দুর
প্রিয় বন্ধু।
সে আমার সাথে সারাদিন খেলা করে গল্প করে এবং যাওয়ার আগে পর্যন্ত নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে যায় এবং ডুবে গেলেও সে চাঁদমামাকে ও তারার দলকে তার দিনের বেলার আলো দিয়ে সে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।
তাতে রাতের আকাশে আমার নিজেকে একা না মনে হয়।

রাতের আকাশ

আকাশকে অনুভব করছি, দেখছি রাতের আকাশের তারাগুলো মেঘেদের ভিড়ে উধাও।
প্রতিদিনই আমি দেখি রাতের আকাশ।
বেশ লাগে একগুচ্ছ নীরবতার সাথে ঘনকালো নীলচে অন্ধকারে-
আকাশের মাঝে সাদা মেঘেরা তুলোর মতো ভেসে ভেসে যায় এক প্রান্ত হতে আরেক প্রান্তে।
মাঝে মাঝে এরোপ্লেনের আনাগোনা ঝিকমিক করে লাল নীল সাদা আলো টুনি লাইটের মত জ্বলছে নিভছে- বেশ লাগে।কখনো শুনি, ট্রেনের হুইসিল বেজে ওঠে কখনও ওঠেই না।বেশ ভালো লাগে আমি এসবই অনুভব করি।
আমার এক গুচ্ছ নীরবতা হওয়া, একাকিত্বতা মিলেমিশে তৈরি এক নতুন আমি কে আবিষ্কার করি। এইভাবেও অনুভবের মধ্যে দিয়ে রাতের আকাশকে উপলব্ধি করে সুখ পাওয়া যায়।

সীমান্ত দে
তৃতীয় সেমিস্টার

কৃষক

লকডাউন বাড়ছে যতই অর্থ তো নেই হাতে,
কৃষকের মুখে বিবর্ণ ছাপ ভাত পড়বে তো পাতে।
প্রকৃতির শাপে অর্থের চাপে মাঠে না নামলে লাঙ্গল,
রুক্ষ মাটি থাকবে পড়ে তৈরি হবে না ফসল।
এমন যদি চলতেই থাকে আর কয়েকটা মাস,
অনাহারে, যাবে বেশ কিছু প্রাণ সাথে হবে দেশের সর্বনাশ।
কৃষি যে দেশের মানদন্ড আজকে স্বীকার করি।
কৃষক যোজনা আনতে মন্ত্রী তাই এত তড়িঘড়ি,
একে ভাইরাস, তাই আম্ফান ওপরে পঙ্গপাল।
কৃষক ভাইয়েরা নিঃস্ব হয়েছে দেশটা যে বেসামাল।
এই পৃথিবীতে যত সম্মান পায় উচ্চবিত্ত লোক,
তার চেয়েও দ্বিগুন এর দাবি রাখে এ কৃষক লোক।
এই অসময়ে যতোটুকু পারো দাঁড়া ওদের পাশে
বহু চেষ্টাতে ভালোবাসা দিয়ে যদি এই দেশটা বাঁচে।

অর্কদীপ দে
তৃতীয় সেমিস্টার

ব্যর্থ প্রেমিক

তোমাকে পাওয়া ছিলনা আমার সাধ্য
তাই ভুলতে হচ্ছি বাধ্য
সময় পেলে মনে রেখো অল্পস্বল্প
তোমায় ছাড়াই লিখবো
আমি জীবনের নতুন গল্প
পরের জন্মে
আবার এসো
আমায় তুমি ভালবেসো
নতুন কোনো শহরে নতুন কোনো ঘর
আমি হয়তো
সেখানের নতুন কোনো জাতিস্মর।

ওয়াজিদ মিদ্দে
তৃতীয় সেমিস্টার

অনন্ত প্রেম

তোমার শহরের মত আমার শহরে জ্বলেনা আলো।
তোমার শহরের মত আমার শহরে কেউ বাসেনা ভালো
তোমার শহরের মত আমার শহরে নেই কেউ আনন্দে
তোমার শহরের মত আমার শহরে কেউ নেই ছন্দে।

ছন্দ মিলিয়ে লিখছি কবিতা ঠিকি
তুমি বলতে পারবে এ ছন্দের কারণ কি ?

নেই কোন কারণ এই ছন্দের
নেই কোনো মুহূর্ত আনন্দের।
তুমি হয়তো আজ অন্য কারোর সাথে সুখী
আর আমি নিস্তব্ধতায়
লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি।

বহুভাষাবিদ তথা ভাষাবিজ্ঞানী ড.মহম্মদ শহীদুল্লাহ

অধ্যাপিকা ঋতমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার স্বরূপ আবিষ্কারের অন্যতম পথিকৃৎ ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় পন্ডিত ছিলেন না, তিনি আয়ত্ত করেছিলেন ২৪ টি ভাষা। তার মধ্যে ১৮টি ভাষায় ছিল তাঁর অগাধ পান্ডিত্য।

১৮৮৫ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনার হাড়োয়ার পিয়ারা গ্রামে তাঁর জন্ম।যে বাড়ি আজও আছে। পরিবারে ছিল সুফি ঐতিহ্য। এই মানুষটি দারিদ্র্য, সামাজিক বাধা, অবমাননার বিরুদ্ধে সারাজীবন লড়াই করে গেছেন। কলকাতা, ঢাকা, প্যারিস নানা জায়গায় শিক্ষা ও কর্মসূত্রে গেলেও, মাতৃভূমিকে ভুলতে পারেননি কোনদিনই তীনি।একটি চিঠিতে শহীদুল্লাহ লিখেছেন,
দেশান্তরে থাকিলেও যেমন জননী বদলায় না, সেইরূপ জন্মভূমি ও বদলায় না।

উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি সংস্কৃত অনার্স পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ ক্লাসে ভর্তি হন। এর আগে কোন মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সংস্কৃত ভাষাচর্চায় এত দূর এগোননি। তবে তার মাসুলও গুণতে হয়েছিল তাঁকে। মুসলমান হওয়ার 'অপরাধে' তাঁকে পড়াতে অস্বীকার করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদের অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রমী। বলেন, 'যবন' সন্তানের কানে তিনি বেদমন্ত্র তুলে দিতে পারবেন না। শহীদুল্লাহ ক্লাসে থাকলে বেদপাঠ শুনে ফেললে তাঁর কানে গরম সিসে ঢেলে দেওয়ার বিধান ছিল তখনও!একদা অনার্য শম্ভুককে বেদপাঠের জন্য 'পুরুষোত্তম' রামচন্দ্র হত্যা করেছিলেন।

সেই ধারার অনুসারীরা বিংশ শতাব্দীতেও হাজার বছরেরও শিক্ষায়তনে তাঁদের ইচ্ছে নিয়ে ছিলেন, অন্ধকারে। সামশ্রমী মহাশয়ের সমর্থক পণ্ডিতেরাও ছিলেন। এর বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। 'দি বেঙ্গলি' পত্রিকায়। লিখেছিলেন,
এই পন্ডিতদের পবিত্র গঙ্গার জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত।

তবে পরবর্তী সময়ে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় ও কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিনি বেদপাঠের অনুমতি পেয়েছিলেন। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এ বছরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযোজন করেন এক নতুন বিভাগ। তখন 'শাপে বর হয় বাঙালি তথা বাংলা ভাষার।' তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে নথিভুক্ত হয় শহীদুল্লাহর নাম। এর সাথেই রোপিত হয় বাংলা ভাষাবিজ্ঞান চর্চার জগতে এক মহীরূহ বীজ।

দারিদ্র্য, শহীদুল্লাহকে দীর্ঘদিন তাড়া করে ফিরেছে। ভাষা সাধনা করলেও পড়াশোনা ছেড়ে কাজে যোগ দিতে হয়েছিল। স্কুল মাস্টারি, অনাথ আশ্রমের ম্যানেজারি, ওকালতি কী না করেছেন তিনি! ওকালতির তখনকার উপাধি ছিল B. L(Bachelor of Law)।
সাধুসম মানুষটি বলতেন,
'Bad Livelihood' অর্থাৎ 'বাজে পেশা'।

আশুতোষ এই বাজে পেশা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে আনলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর্থিক সংকট ছিল। ৫০ টাকা বেশি মাইনের জন্য তাঁকে যেতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।যেখানেই থাকুন, বাংলা ভাষার স্বরূপ সাধন ছিল তাঁর লক্ষ্য।

চর্যাপদ কোন ভাষার আদি উদাহরণ ?
দাবিদার অনেক। ওড়িয়া, অসমীয়া, মৈথিলী এবং বাংলা।
শহীদুল্লাহ যুক্তিসিদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করলেন জোরদার বাংলার দাবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের (পুঁথির নাম-শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ) ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষাও তিনি করেন।

১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন পূর্ববঙ্গে বাঙালির দ্বিতীয় নবজাগরণ নিয়ে আসে। কিছু সুযোগসন্ধানী দালাল জাতীয় মানুষ এবং মৌলবাদীরা মুসলমানের মাতৃভাষা 'উর্দু' বলে সওয়াল করতে থাকে। তাঁরা মুসলমান বাংলা নামে আরবি ফারসির জবরদস্তিতে কণ্টকিত বাংলা ব্যবহার করতে চাইলেন। নজরুল ইসলামের বিখ্যাত গান 'নব নবীনের হয়ে গেল 'তাজব তাজার; 'সজীব কবির মহা শ্মশান' হয়ে গেল 'সজীব কবির গোরস্থান'।

শহীদুল্লাহ নিজে ধর্মনিষ্ঠ মানুষ হয়েও কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র তাঁর মধ্যে ছিল না। ছিলেন, উদার মানবতাবাদী। রামকৃষ্ণ মিশন এর উদ্বোধন পত্রিকায় 'হিন্দু মুসলমান মিলন' ও গীতা ও কৃষ্ণতত্ত্ব নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। মানবতাবাদের সঙ্গে সাবলীলভাবে মিশে ছিল বাঙালি হিসেবে তাঁর স্বাজাত্যবোধ। তিনি তাই তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন উর্দুপন্থী দালালদের। তাঁর ভাষায়, এদের কলম বোধ হয় বনমানুষের হাড় দিয়ে তৈরি।

১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে অভিভাষণ তার উক্তি ঐতিহাসিক ঘোষণায় পরিণত হয়েছে, আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয় এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা তিলক টিকিয়া বা টুপি দাড়ি লুঙ্গিতে তা ঢাকবার উপায় নেই।

দেশের জ্ঞানতাপসদের মধ্যে এক ধরনের নিষ্ঠা বিনয় ও উদার মানবতাবাদের আলো দেখা যায়। শহীদুল্লাহ ছিলেন সেই ধারার অনুসারী।

আজ যখন সাম্প্রদায়িকতা ও আত্মবিস্মৃতিতে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন, তখন শহীদুল্লাহ আমাদের পথ দেখান।

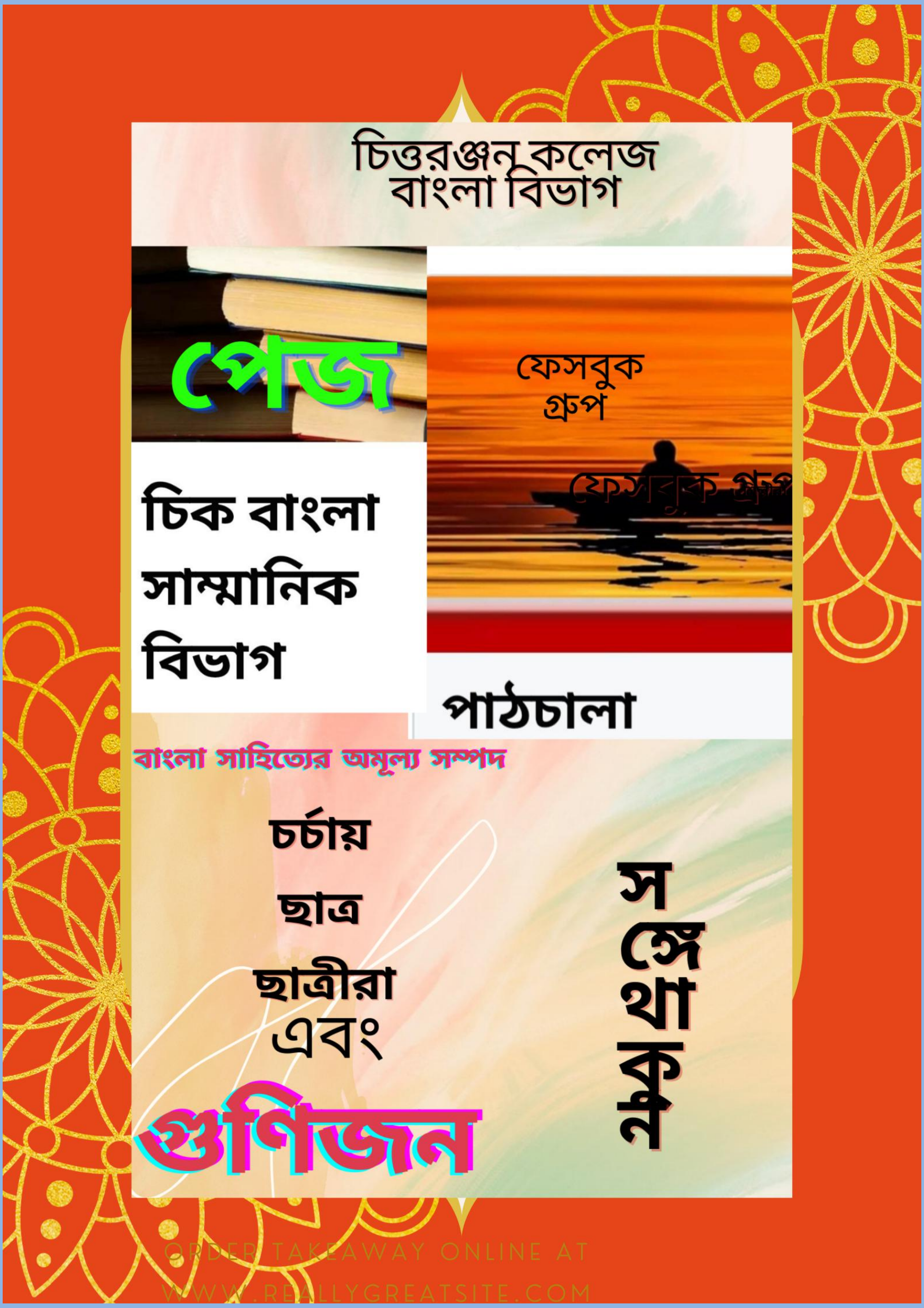
চিত্তরঞ্জন কলেজ
বাংলা বিভাগ
পেজ
ফেসবুক
গ্রুপ
ফেসবুক গ্রুপ
চিক বাংলা
সাম্মানিক
বিভাগ
পাঠচালা
বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ
চর্চায়
ছাত্র
ছাত্রীরা
এবং
গুণিজন
সঙ্গে থাকুন
ORDER TAKEAWAY ONLINE AT
WWW.REALLYGREATSITE.COM

চন্দ্রাণী পাল
পঞ্চম সেমিস্টার

দার্জিলিং ভ্রমণ

আমি প্রতি বছরই ঘুরতে যাই।বিশেষ করে শীতকালে।একদিন বাড়ির সবাই মিলে ঠিক করলাম দার্জিলিং ঘুরতে যাওয়া হবে।চারদিন আগে থেকে আমরা সব গোছানো শুরু করলাম।দার্জিলিং ছাড়াও আমাদের গন্তব্য পৌঁছানোর যাত্রা পথটা ছিল খুব সুন্দর আমাদের যাত্রা শুরু হয় শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে করে।আমরা সারারাত ট্রেনে থাকি এবং পরের দিন সকালে আমরা সবাই পৌঁছলাম জলপাইগুড়ি স্টেশন।তারপর আমরা গাড়ি ভাড়া করে দার্জিলিংয়ের পথে রওনা দিলাম।গাড়িতে উঠে ঘন্টাখানেক পর থেকেই জানালা দিয়ে দেখি বাইরের প্রকৃতির চেহারা বদলে যেতে শুরু করছে। আর কিছুক্ষণ পর দেখি দু'পাশে পাইন গাছ। তিন ঘন্টা পর আমরা দার্জিলিং এসে পৌছালাম। দার্জিলিং পৌঁছানোর পর পাহাড়ের অপূর্ব রূপ দেখে আমাদের মনটা আনন্দে ভরে গেল। দার্জিলিংয়ে আমাদের থাকার জায়গা আগে থেকে নির্ধারিত ছিল।সেখানে পৌঁছে দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিলাম।বিকালে আমরা সবাই সূর্যোদয় দেখতে গেলাম।দ্বিতীয় দিন আমরা চা বাগান দেখতে গেলাম।পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে এখানকার অধিবাসীরা চা চাষ করে থাকেন। আমরা চা বাগানের গুদাম থেকে খুব অল্প দামে চা পাতা কিনলাম।পরেরদিন সকালে দার্জিলিংয়ের অন্যতম আকর্ষণ টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখলাম। তারপর আমরা কাঞ্চন জঙ্ঘা শৃঙ্গ দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল।তারপর আমরা টয় ট্রেন চড়ে পুরো দার্জিলিং শহরটা ঘুরলাম।সেখান থেকে আমরা ছোট ছোট ঘন্টা,পাহাড়ি শাল, বুদ্ধ মূর্তি, ছাতা ইত্যাদি জিনিস কিনলাম।পরেরদিন সকালে আমরা দার্জিলিংয়ের চিড়িয়াখানা দেখতে গেলাম।সেখানকার চিড়িয়াখানার অন্যতম আকর্ষণ স্নেক গার্ডেন। এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাপ দেখতে পাওয়া যায়।পরেরদিন আমরা সবাই বাড়ি যাওয়ার পথে রওনা হলাম।এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিভাগীয় প্রাক্তনী

অর্ণব নায়েকের অনবদ্য গল্প

খুনি

আদালতে আজ তৃতীয় শুনানি। প্রথম শুনানির দিন আদালত ছিল প্রায় জনশূন্য। কিন্তু আজ হল ভর্তি। সবার নজর সন্তানের বুকে ছুরি চালানো বাবার দিকে, আর তার চোখ নিবদ্ধ পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে, চোখের নোনতা জল থেকে যেন প্রাণ নিচ্ছে নোংরা নখগুলি। বিচারক এখনো এসে উপস্থিত হননি।

মানুষের চরিত্র কিংবা অবস্থা হল অনেকটা গিরগিটির মতো।কখন কোন মুহূর্তে তার রং বদলে যায় তা আগে থেকে বোঝা মুশকিল।যদি বা আগে থেকে আন্দাজ করা যায়, যে কী হতে পারে তাও সমাধানের নিয়ম জানা নেই।

রথীন গ্রামের ছেলে। পুরো নাম রথীন মাঝি। পড়াশোনার শেষে ফিরে যায় গ্রামে। পরিবারের কেউ মাধ্যমিকের দোড়গোড়ায় পৌঁছতে পারেনি সে বাড়ির ছেলে গ্র্যাজুয়েট! তার মানে অনেক বিদ্যা! কিন্তু দরিদ্র পরিবারে বিদ্যেটা কিছু নয়। যারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের বিদ্যে নিয়ে হবেটা কী! তাই রথীনকে ফিরতে হয়েছিল গ্রামে।

গ্রামের দিকের একটা কারখানায় রথীন চাকরি পাওয়ায়, পরিবারের অন্নাভাব কিছুটা দূর হল! যে পরিবার পাঁচশো টাকার মুখ দেখেনি, মাসে তিনহাজার টাকায় তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই!

রথীনের বাবা পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। মাকে এখন অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হয় না! ওই টাকায় তাদের দুজনের দু'বেলা ভালোই চলে যায়। কাজে মন দেবার জন্য তার কর্মোন্নতিও ঘটে!হিসাবরক্ষকের কাজ পায় রথীন।মাইনে বেড়ে দাঁড়ায় সাত হাজার। কর্মহীন মানুষ তার কর্মের চাহিদা মেটাতে চায়, যদি সে কর্মঠ হয়!রথীনের মা আগে চার পাঁচ ঘর কাজ করত, এখন তাকে কেবল নিজের বাড়ি সামলাতে হয়!

এই ধরনের মানুষের প্রধান আবদার ছেলের বৌ। মানে অনাবশ্যক খরচটা যদি একটু বাড়ানো যায়! তাছাড়া পরের বাড়ির মেয়ের মাথা অতীব সুমিষ্ট, মাঝে মাঝে তার সাথে রংতামাশা করার মত কাজ এই জীবনে আর কিছুই হয় না!
বৌমা যদি লক্ষীস্বভাবের হয়, শাশুড়ি তাঁকে নিজের মত করে গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়, আর কিন্তু বা পরন্তু দর্জাল হয়, তাহলে তো শাশুড়ির আনন্দের সীমা থাকে না! একটা না একটা ঘটনা নিয়ে সারাজীবন কেটে যায়!

যাই হোক, মা'র আবদারে বা সময়ের নিয়মে রথীনের বিয়ে হয়। মেয়েটি অত্যন্ত শান্ত।সবাইকে নিয়ে চলতে থাকে।আর রথীনের কাছে বৌ হয়ে দাঁড়ায় ভাগ্যশ্রী, কারণ তার প্রমোশন আরো একধাপ বাড়ে। সুখ-শান্তি নিয়ে রথীনের জীবনের দিনগুলো বিনা বাধাতেই অতিক্রম করছিল! এরপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আরো আনন্দের সংবাদ আসে! গ্রামের ডাক্তার দিদিমণি রথীনের বৌয়ের লক্ষণ দেখে বলে, সে বাবা হতে চলেছে!

রথীন বাবা হল। কিন্তু গিরগিটিময় জীবন। রং বদল করল। রথীন বাবা হল বটে, কিন্তু সে তার ভাগ্যশ্রী বৌকে হারাল। ছেলেটির বয়স যখন দু'বছর তখন হঠাৎ কারখানা গেল উঠে! কষ্টময় জীবনে দুঃখ বাড়তে থাকে! ছেলের বয়স যখন চার, আবার এক দুর্ঘটনা ঘটল!বাড়িতে লাগল আগুন। রথীন সেদিন গ্রামের বাইরে কাজ খুঁজতে গিয়েছিল! বাড়ি ফিরে দেখে বাড়িতে আগুন লেগেছে। মা নাতিকে নিয়ে ঘরের ভেতরেই ছিল। আগুন নিভিয়ে ঘরে গিয়ে দেখা গেল রথীনের মা নাতিকে বুকে জড়িয়ে পড়ে আছে! মা তার নাতির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হতে দেয়নি, কিন্তু তার শরীর নিথর, তাতে আর বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই! রথীনের ছেলে মহানন্দে কাঁদতে থাকে, যেন বুঝিয়ে দেয়, বাবা আমি আছি। জানিনা তোমার জীবনে কী কী সর্বনাশ আমি দেখবো বা ঘটাবো!

মানুষের দুঃখের জীবনে নেশাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে কাছের সঙ্গী। আর নেশারূপ সঙ্গীকে নিয়েই চরমতম সর্বনাশের জন্য যেন অপেক্ষা করতে থাকে রথীন। কিন্তু সে দিনদিন ভেঙে পড়ে, কাজ করতে মমতা বোধ করে না মন। সে ছিল উচ্চ ভিলাষী, আর সে এ সময়ে নিরাশায় ভোগে।

ছেলের বয়স ছয় হতে যায়। ভাবে আবার কোন দিক থেকে দুরাশা নামবে! অষ্টমীর দিনও রথীনের ছেলে বুড়ো, আশা করে বসে থাকে বাবা নতুন জামা নিয়ে আসবে! হায়রে দু'বেলা খাওয়া জোটে না আর জামা ? রথীন সারাদিন আর বাড়ি ফেরে না! কারণ আজও সে খাবার জোটাতে পারেনি, ছেলের মুখে তুলে দেবার জন্য। সারাদিন ধরে ছেলেটি যখন কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে, রথীন তখন চোরের মত চুপিচুপি বাড়িতে ঢোকে! দূর থেকে শোনা যায়, পুজোর ঘন্টাধ্বনি। কাঁসরের আওয়াজ। ঢাকের বাদ্যি। বিধাতার পৈশাচিক উল্লাস! ছেলেটির মাথার কাছে একটা মুড়ির প্যাকেট রেখে চুপিসারে বেরিয়ে যায় রথীন।

নবমীর দিন কিছুই জোটাতে পারেনি রথীন, তাই তার বাড়ি ফেরা হয়নি। দশমীর দিন কাজ জোটায় রথীন। কুড়ি টাকা আয় হয় তার।পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। সে ভুলেই যায় তার বাড়িতে ছয় বছরের বাচ্চা আছে। সে নিজের ক্ষিধে মেটায়।
দশমীর রাত।বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রথীন। তার চোখ আটকে যায় কিছু কুকুরছানার দিকে। কুকুর ছানাগুলো তার মার চারপাশে লাফালাফি করছে।আর তাদের মা মুখে তুলে দিচ্ছে খাবার। রথীনের বিবেকবোধ যেন হঠাৎই জেগে ওঠে।তার মনে পড়ে তার বাড়িতে তার একটি সন্তান আছে। হয়তো আজও তার খাওয়া জোটেনি। ক্লান্ত মনে এগিয়ে চলে রথীন। সে শুনতে পায় মার বিসর্জনের বাদ্যি। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় রথীন। তার মনে হয় একটা কুকুরও বোঝে সন্তানের পেটের জ্বালা আর সে তো মান আর হুঁশ মিলিয়ে মানুষ।

দরজা খুলে রথীন দেখে, ঘর পুরো অন্ধকার। আলো জ্বালিয়ে দেখে, ছেলে যেখানে শুয়ে ছিল সেখানেই একইভাবে শুয়ে আছে। মুড়ির প্যাকেট যেভাবে রেখে গেছিল সেভাবেই মাথার কাছে রাখা।ঘরের কোন জিনিস একচুলও জায়গা পরিবর্তন করেনি। প্রথমে রথীনের মনে হয়, ছেলের অভিমান, পরক্ষণেই তার এই ভেবে হাসি আসে, যে খেতে পায় না তার আবার অভিমান! তখন রথীনের মনে ভাবনা হল।গায়ে হাত দিয়ে বুঝল, তার মন ঠিক বলছে। তার ছেলে তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে! তাই কোন সাড়া নেই। রাগে দুঃখে রথীনের মন বিষিয়ে যায়। রান্নাঘর থেকে একখানা ছুরি এনে বারবার ছেলের বুকে আঘাত করে। ছেলের শরীর থেকে একটুও রক্ত বের হয় না। রথীনের মনে হয় ছেলেটা তাকে ব্যঙ্গ করছে!

মৃত সন্তানকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকে দরিদ্র বাবা। ছেলেকে নিয়ে থানার দিকে এগিয়ে চলে। ছেলের দেহ পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। ছেলের মাথায় হাত বোলাতে থাকে সে। দারোগা ধমক দেয়, ছেলেকে মারার সময় এমন মায়া কোথায় ছিল?
রথীন কোন প্রতিবাদ করে না।
বিচারক ডেকে ওঠে,
রথীন।
হঠাৎ হুঁশ ফেরে রথীনের।
বিচারক বলেন,
পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী
তোর ছুরির আঘাতে ছেলেটা মরেনি। তার আগেই সে মারা যায়। তুই নির্দোষ।
রথীন চিৎকার করে উঠে বলে,
না!!
যে এতদিন এত চুপচাপ ছিল তার গলার এত জোর আওয়াজ শুনে বিচারকও চমকে ওঠে!

রথীন বলে,
হে ধর্মাবতার, একটা কুকুরও বোঝে তার সন্তানের ক্ষিধের জ্বালা! আর আমি মানুষ হয়ে পারিনি। আমি রক্ষক হয়ে ভক্ষক হয়েছি! ছেলের ক্ষিধের জ্বালা মেটাতে পারেনি। যে ছেলে জন্মে তার মাকে গ্রাস করেছে, বাবাকে করেছে খুনি, তাই এই বাবা খুনির তকমা নিয়ে সারাজীবন থাকতে চায়।

আঁকিবুকি

জ্যোতি বাগ

পঞ্চম সেমিস্টার

Wishing all our dear
customers a Happy Diwali!
ORDER TAKEAWAY ONLINE AT
WWW.REALLYGREATSITE.COM

জ্যোতি
বাগ

স্নেহাশিস দাস

তৃতীয় সেমিস্টার

স্মৃতিকথার ডায়রি

পঞ্চম সেমিস্টার

ফারিনা খাতুন

আমার চোখে দেখা কুমারটুলি

৬/১০ তারিখে আমরা সবাই ভাবলাম কুমারটুলি ঘুরে আসা যাক। কারণ সেই দিনটি ছিল মহালয়ার দিন। আমার ম্যাম এবং বন্ধুরা মিলে যাবো ভাবলাম।মহালয়ার দিন দেবীপক্ষের সূচনাকালে কুমারটুলি ভ্রমণ করতে গিয়েছিলাম।তখন ভোর ৫ টা। ঘুম ভাঙল। দিনটা ছিল মহালয়া।বেড়ানোর জন্য তৈরি হয়ে ঠিক ৬ টা নাগাদ বের হলাম কুমারটুলি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন ভিতর ভিতর একটা আনন্দ কাজ করছিল।৭টার সময় ওখানে পৌঁছলাম। গিয়ে ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল এবং সেদিন চারদিক দেবী আসার আনন্দে যেন মেতে উঠেছিল সবাই। দীর্ঘক্ষণ কুড়ি পঁচিশটা ঠাকুর দেখার পর একটু টিফিন করে নিলাম। আমাদের সঙ্গে সেখানকার কিছু বাচ্চারাও টিফিন করল। খুব আনন্দ হল তাই। একটি লোকের কথা মতো কুমারটুলির প্রধানতম শিল্পী মোহনবাঁশি পালের কাছে গেলাম এবং দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের কথা শুনলাম। এছাড়াও প্রতিটি শিল্পীর হাতের কাজই নিখুঁত। তারপর কিছুটা ঘুরে বাড়ি চলে এলাম। সেদিনটা খুব ভাল ঘোরা হল।এবং অনেক কিছু দেখা ও জানা গেল।

প্রথম সেমিস্টার
রূপম চক্রবর্তী

সুন্দরবনের অপরূপ সবুজের মাঝে

ইচ্ছে ছিল এমন এক জায়গায় যাওয়ার যেখানে নদী আর গহীন অরন্যের মাঝে হারিয়ে যাওয়া যাবে। যেখানে বন্যপ্রাণিরা প্রতিনিয়ত সবুজ দুনিয়ায় খেলা করে, ভোরে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। যেখানে গেলে সাগর, নদী আর সবুজের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে একটুও আফসোস হবে না। আর ঠিক সেই জন্যই সুন্দরবনে যাওয়া।

ঝলমলে শহরের গৎবাঁধা যান্ত্রিক নিয়মের গণ্ডি ছেড়ে, ছোট একটা ট্রলি ব্যাগ নিয়ে এক রাতে চড়ে বসলাম বাসে। সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু। মংলায় আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হল হোটেল রয়েলে। সেখান থেকে যাওয়া হবে সুন্দরবন। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করার আগে একটা ভ্রমণ পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সেই মতে পরদিন ভোরে নির্দিষ্ট ভ্রমণতরীতে গিয়ে উঠলাম। আমরা ছারাও আরও অনেকেই ছিলেন এই যাত্রায়। একে একে সকলে এসে বসার পর গাইড বলে দিলেন কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আমাদের প্রথম স্টপ ঢংমারি ফরেস্ট স্টেশন। নদীর দু-ধার ধরে জেলেরা নদীতে মাছ ধরছে। কঠিন জীবন ব্যবস্থা। এক এক করে আমতলি, বাণীশান্তা, ডাইমারি পেরিয়ে পৌছালাম সুন্দরবনের দোরগোড়ায়। ঢংমারি ফরেস্ট স্টেশন থেকে বনে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে নিরাপত্তি কর্মীর সঙ্গে চললাম শরণখোলা নীল কমল এর উদ্দেশ্যে।

শান্ত-শীতল চারপাশ, শুধু লঞ্চের ইঞ্জিন এর আওয়াজ। যেদিকেই চোখ যায়, সেদিকেই শুধু সবুজের হাতছানি। নীল আকাশে উড়তে থাকা নাম না জানা পাখি আর পশুর নদীর রূপ দেখে যেন মন হারিয়ে যায়।

প্রথম সেমিস্টার
সৌমেন রায়

আমার শহর বালি

হাওড়া থেকে উত্তরে গেলে জেলার সর্বশেষ স্টেশনটি হল "বালি"। "বালি" শহরটির বিষয়ে বলতে গেলে হয়তো সব বলেও কিছু বলা হবে না। আমার শহর বলে বলছি না, এই বালি শহরে নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে নানান কিছু রয়েছে। এই শহরে কিছু বিখ্যাত জায়গা রয়েছে যেমন - "রবীন্দ্রভবন ঘাট" বিকেল হলেই এখানে নানা মানুষের ঢল নেমে আসে, ছোট-বড় সকলেই এখানে এসে সময় কাটায়, তারপর "বালি অ্যাথলেটিক ক্লাব" বালির নামকরা একটি ফুটবল ক্লাব যেখানে আশি নব্বই দশকে উঠে এসেছে অনেক প্রতিভা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মোহনবাগানের প্রাক্তন প্লেয়ার এবং অধিনায়ক সত্যজিৎ চ্যাটার্জি। বাঙালির সরস্বতী পুজো মানেই নিমতলার বালির 'জলের ঠাকুর সরস্বতী'। পুজোর দিন থেকেই বিভিন্ন এলাকার মানুষেরা এখানে ভিড় জমান, এটি একটি বিখ্যাত পুজোর মধ্যে একটি। এই পুজো উপলক্ষে এখানে দুই সপ্তাহের জন্য মেলা বসে সেখানে নানান ধরনের দোকান থাকে। এরপরই আসে দুর্গোৎসব। বালি শহর দুর্গোৎসবের জন্য খুবই বিখ্যাত একটি জায়গা যেমন- "বাঁশেরকেল্লা", "প্রিন্সেপ ঘাট", "চন্দ্রযান অভিযান" ইত্যাদি বিষয়ের থিম গুলোর জন্য পুরস্কৃত হয়েছে। এরপরই আসে কালিপূজা। বালি কল্যানেশ্বর তলা ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রতিবছরই নানান থিমের কালিপূজা অনুষ্ঠিত হয় , বালির এই ভিডিওটি এতটাই জনপ্রিয় যে, এখানেও নানান জায়গা থেকে মানুষ আসে ঠাকুর দেখতে এটিও একটি গর্বের বিষয়। এরপরই আসে বছরের শেষ একটি উৎসব এটি শুধু বালি শহরের মানুষেরাই উদযাপন করে, সেটি হলো "রাশের মেলা"। খুবই বিখ্যাত এই মেলাটি, প্রায় দুই সপ্তাহ থাকে। নানা মানুষের ঢল নেমে আসে এ কদিনে। আমার শহরে যদি আসেন, আমি এইটুকুই বলব, আপনার মন ভরে যাবে।

আমাদের ওয়েব সাইট কাম লাইব্রেরী
আছে। নাম "ক্লাসিক পদ্মা গঙ্গা" ।
সেখানে আমরা সারা বিশ্বের পাঠকদের জন্য
অনামী লেখকদের গল্প,কবিতা,প্রবন্ধ এবং
আঁকা সংগ্রহ করি।
আমরা আপনার লেখা গল্প পেতে চাই।
আপনি যদি এই ব্যাপারে আমাদের
সহযোগিতা করেন তবে বাধিত হই।
ই বুক আমরা বানিয়ে নেবো। সেখানে
থাকবে আপনার পরিচিতি,ছবি যাতে সারা
বিশ্বের পাঠকরা আপনাকে চিনতে পারে।
আমাদের লাইব্রেরী লিংক
www.pgpen.com সুতরাং
দেরী না করে আজই দেখুন
আমাদের ওয়েব সাইট।
ক্লাসিক পদ্মা গঙ্গা

নমস্কার